চা-শ্রমিকের মাতৃভাষা

দীপংকর মোহান্ত
আশফাক হোসেন

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookDeepnkar

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৩-২৪ সালে সিলেট-আসামের পর্বতবেষ্টিত ঘন জঙ্গলের টিলায় চা-গাছের সন্ধান পেয়ে ১৮৩৬ সালের মধ্যে পুরো আসাম, জৈন্তা, কাছাড় প্রভৃতি জনবিরল বনাঞ্চল ছলে-বলে ও কৌশলে নিজেদের আইনি অধিকারে নিয়ে যায়। প্রারম্ভিক লগ্নে চা-আবাদ পর্বে শ্রীহট্ট-আসামে লোকসংখ্যা ছিল খুব অল্প। তবু ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় শ্রমিক কিংবা গিরিপথের গহিনে থাকা কোনো মানুষকে অধিক লোভ দেখিয়েও চা-শ্রমের কাজে নিয়োগ করতে পারেনি। চা আবিষ্কারের সময় বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেখেছে স্থানীয় নীল চাষিদের দ্রোহী মানসিকতার রগরগে অবস্থা– যা নীল চাষাবাদের জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অশনি সংকেত দেয়। অর্থাৎ নীল চাষের পড়ন্ত বেলায় কোম্পানির নিকট চা-ই ছিল একমাত্র রপ্তানিযোগ্য আয়– যে কারণে তারা ভূমি লিজ আইন সহজ করে চা-আবাদে প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে থাকে। এমনকি স্থানীয় শ্রমিকের অভাবে তারা চীন থেকে চা-আবাদে দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করে চা শিল্পের সূচনা-লগ্নে সলতে পাকানোর কাজ অব্যাহত রাখে। এই শিল্পকে গতিশীল করতে অচিরেই গড়ে ওঠে 'আসাম টি কোম্পানি' বা 'আসাম কোম্পানি' (১৮৩৯)। কিন্তু ১৮৬০ সালের আগে চা-শিল্প খুব একটা বাজারমুখী হতে পারেনি। ১৮৬৬ সালে ভারত থেকে ৪% চা বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল (তখন চীনের রপ্তানি ছিল ৯৬%)।

যদিও সিলেট-আসামের পাহাড়ে চা-আবাদের জন্য অঢেল জমি সহজ শর্তে বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। কিন্তু নব্য গড়া এই শিল্পে মূল উৎপাদক শক্তি শ্রমিকের জোগান ছিল অল্প। ঔপনিবেশিকরা শ্রমিক সংকট কাটানো বা শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তখন বিকল্প চিন্তা করতে থাকে। ফলে তাদের শকুনি চোখ পড়েছিল ভারতের দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের নিরন্ন মানুষের দিকে। যাদের নিশ্চিত কোনো খাওয়া-খাদ্যের সংস্থান ছিল না। তারা জীবন-যুদ্ধের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, গাছ থেকে পয়সা পড়ে– এমন বিশ্বাসে চিরতরে ঘর ছাড়তে হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব টিলা-ভূমে বৈচিত্র্যময় ভাষিক জনগোষ্ঠীর আগমন

অবশেষে ১৮৪১ সালে বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে প্রলোভন দেখিয়ে কিছু লোক সংগ্রহ করা হয়েছিল। মূলত তারাই ছিল আসামের দিকে পা রাখা প্রথম শ্রমিকের চালান। দালালরা এই লোকদের একটি নৌকায় তোলে আসামের দিকে জল-পথে রওয়ানা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, প্রথম চালানের সকল হতভাগ্য লোকজন আসাম পৌঁছার আগেই রাস্তায় বিভিন্ন রোগে মারা যায় (ফুকন, ১৯৮৪, পৃ. ৪)। তারপরও চা-করদের শ্রমিক সংগ্রহের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। ১৮৬০ ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তায় চা-বাগানের জন্য শ্রমিক সংগ্রহকারী হিসেবে শক্ত ও ধুরন্ধর প্রকৃতির 'আড়কাটি'দের (শ্রমিক সংগ্রহের দালাল) মাধ্যমে

তৎকালীন বিহার (রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, ডুমকা, গয়া, প্রভৃতি), উড়িষ্যা (ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, সম্বলপুর, চাইবাসা প্রভৃতি), মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ (ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, রায়পুর, রামপুরহাট, জব্বলপুর প্রভৃতি), নেপাল, গারো পাহাড়, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিককে প্রলোভন দেখিয়ে শ্বাপদসংকুল পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়।

'আড়কাটিয়া'রা অভাবী মানুষের কাছে গিয়ে মিথ্যা গল্প জোড়ে বলতো– আসামের জঙ্গলে টাকার গাছ আছে। 'গাছ হেলাঙ্গেনেছে/হেংলানেছে– পয়সা মিলেগা' অর্থাৎ আসামে গাছে ঝাড়া দিলে বা হেলান করলে পয়সা পড়ে। পাহাড়ে কোনো কাজ নেই। সেখানে পয়সা পাবে, আর খাবে। কৃষিকাজে অভ্যস্থ সহজ-সরল মানুষগুলো জানতো না যে তারা কোথায় এবং কী কাজে যাচ্ছে। অথচ সিলেট-আসামের পাহাড়ে একবার আসার পর 'গিরমিট' প্রথায় তারা হয়ে যেত 'চিরকালের শ্রমদাস'। কখনো স্বদেশমুখী হওয়ার সুযোগ ছিল না।

নিঃস্ব ও অসহায় শ্রমিকরা সিলেটের পাহাড়ে যখন পৌঁছে, তখন তাদের শরীরে ছিল সামান্য একটুকরো কাপড়। এই যা সম্বল। কিন্তু তাদের সাথে ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা এবং বিশ্বাসবোধ। চতুর ঔপনিবেশিক সরকার চা-বাগানের ভেতর শ্রমিক-বস্তি গড়ে তোলার সময় অনেক চিন্তা ভাবনায় আগতদের ভাষা-সংস্কৃতি ও জাত এবং স্থানভিত্তিক বস্তি/পাড়া বসায়। অর্থাৎ একই ভাষাভাষী লোকজন যেন মনে করে একই পাড়ায় রয়েছে। চা শ্রমিকদের সিলেট অঞ্চলে আসা ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে সীমিত হয়ে আসে। দেশ ভাগের সময় কিছু শ্রমিক ভারতে চলে যাওয়ার কারণে কয়েকটি বাগানে নতুন করে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মুসলিম সমাজের শ্রমিক প্রবেশ করতে দেখা যায়। পরে তারাও নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে পুরো রক্ষা করতে পারেনি। এখন তারা সংমিশ্রিত উচ্চারণে কথা বলে।

চা বাগানে বৈচিত্র্যময় ভাষার-হাট

বর্তমান বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৬৮/৬৯ (খাগড়াছড়ির অঞ্চলে নতুন প্রকল্প সহ); ২০২০ সালে ছিল ১৫৯টি। ১৯৭০ সালে ১৫০টি (মূলত ব্রিটিশ আমলে গড়া) হাল আমলে দিনাজপুর-পঞ্চগড় এবং খাগড়াছড়িতে চা উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। নবগঠিত চা বাগানে মূলধারার শ্রমিকসহ বাঙালি শ্রমিকদের প্রবেশ লক্ষণীয়। দেশের শতবর্ষী চা বাগানগুলোতে গোটা ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতশত জাত-পাত, ভাষা ও সংস্কৃতির লোকরা এসে থিতু হয়েছিল। ফলে সবুজবরণ চা বাগানের বস্তি এলাকায় বৈচিত্র্যময় ভাষায় দোলা দোল খায়। চা বাগানে বসবাসরত চা শ্রমিকরা প্রাত্যহিক জীবনে নিজেদের পরিবার ও সমাজের মধ্যে পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত মাতৃভাষা ব্যবহার করতো– যেমন: ওড়িয়া ভাষা, সাদ্রী ভাষা, বাংলী (পুরুলিয়া ও মানভূমের বাংলা) ভাষা, সাঁওতালি ভাষা, ভোজপুরি ভাষা, কুরুখ ভাষা, কুড়মালি ভাষা, খাড়িয়া, তেলেগু ভাষা, তামিল ভাষা, মুণ্ডারি ভাষা, সৌরি ভাষা ইত্যাদি। ফিলিপ গাইনের 'চা শ্রমিকের কথা' বইয়ে ১৫৯টি চা বাগানে ১৮টি ভাষার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা: জংলি, সাদরি, ওড়িয়া, ভোজপুরি, সান্তালি, মান্দি, তেলেগু, নেপালি, বিলাসপুরি, মণিপুরি, মুড়া, বিহারি, খাসি, আসামি, ককবরক, মারমা, মগ ও বাংলা। তবে চা বাগানে মণিপুরি ও ককবরক ভাষীর সংখ্যা অতি অল্প।

গবেষক ভার্জিনিয়াস সামাচা-জনগোষ্ঠীকে ভাষা ভিত্তিক প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন (ভার্জনিয়াস, ১৯৯৬, পৃ. ১৬)। যথা– ১. **কোলীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠী–** (সাঁতাল, মুণ্ডা, খরিয়া, হো ও কুর্ক প্রভৃতি); ২. **দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী** (ওরাওঁ, কোন্দ, গোন্দ ও মালপাহাড়ি প্রভৃতি); ৩. **আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী**

(উড়িয়া, বাঙালি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের, হিন্দি ভাষী প্রভৃতি)। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের চা-শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন 'বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন'– সকল চা-জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করেন (এ ব্যাপারে সেমিনার করেছিল)– ১. **বাংলী** (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মানভূম এবং বিহারের সীমান্তবর্তী বাংলা ভাষিক অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদের ভাষা। তারা 'মানভূম বাংলা/ উপবাংলা/'মানভূম ডায়লেক্ট'ও বলেন); ২. **সাদ্রী/সাদরি** (যা 'নাগপুরী ভাষা' নামেও পরিচিতি পায়। বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড থেকে আগত শ্রমিকদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত। উরাং, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিহারি (মুসলমান ও হিন্দু চা শ্রমিক) প্রভৃতি সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত); ৩. **তেলেগু** (মাদ্রাজ থেকে আগত– অলমিক ও নাইডু প্রভৃতি সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত); ৪. **উৎকল বা উড়িয়া** (উড়িষ্যা থেকে যারা আগত এবং আদি উড়িয়া ভাষায় কথা বলে); ৫. **ভোজপুরি**–ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার। যা চা-জনসম্প্রদায়ের কাছে 'দেশওয়ালী'ভাষা নামেও পরিচিত। বিহারের কিছু অংশ এবং উত্তরপ্রদেশের শ্রমিকরা 'বাংলা ও হিন্দি' সংমিশ্রণে যে নতুন ভাষায় কথা বলে– তারা 'ভোজপুরিভাষী'। যা সাধারণের কাছে 'দেশওয়ালী ভাষা' নামে খ্যাত; ৬. **নেপালি** (নেপাল থেকে আগতদের ভাষা); ৭. **গারো** (গারো পাহাড় থেকে যারা এসেছে– আচিক ভাষা)। যদিও উপর্যুক্ত বিভাজন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের ভিত্তিতে বিভাজন করা হয়নি– তবুও চা জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিচয় জানার জন্য সহায়ক বলে ধারণা করা হয়। চা বাগানে আরেকটি উপভোগ্য বিষয় যে, দেশওয়ালি বা 'ভোজপুরিভাষাভাষী'রা আবার 'বাংলী ভাষী'কে (মানভূম/পুরুলিয়ার বাংলা) বলে থাকে 'জংলী ভাষা'; অর্থাৎ পাহাড় অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। চা বাগানে 'জংলী ভাষা' শব্দটির ব্যবহার বেশ প্রাচীন। কেন 'জংলী ভাষা' বলা হলো তা গবেষণা-সাপেক্ষ। বলা যায় চা বাগানে রয়েছে ভাষা বৈচিত্র্যের হাট। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষণা খুব কম। অনেক শ্রমিক টাইটেল পরবর্তন করেছেন। প্রায় সবাই বাংলা সংমিশ্রণে নতুন ভাষা/ বিকৃত বাংলার জন্ম দিয়েও মনের ভাব যেমন প্রকাশ করছে– তেমনি অন্যজন গ্রহণও করছেন। এত ভাষাভাষী একত্রে থাকার পরও তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো কিছু চিন্তা করতে দেখা যায় না। সহস্রাব্দের সূচনায় দীর্ঘ সময় নিয়ে (১৯৯৬-২০০০) লেখক চিন্তায় প্রাচীন পদ্ধতিতে একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা চালিয়ে চা-জনগোষ্ঠীর ভাষিক চিত্র তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন– সেটা নিচে দেওয়া হলো–

বিভিন্ন পদবিধারী চা শ্রমিকদের ভাষা পরিচিতি (অসম্পূর্ণ তালিকা)

উনিশ শতকের গড়ে ওঠা যে-কোনো চা বাগানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি চা বাগানে শতাধিক জাতপাতের লোকজনের বসবাস ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু চা জনগোষ্ঠীর কোনো ভাষাভিত্তিক জরিপ কখনো হয়নি। তাছাড়া– চা বাগানের জায়গার মধ্যে বসবাসরত মোট জনগোষ্ঠী, কাজে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা, চা বাগানের চৌহদ্দির বাইরে বসবাসরত চা শ্রমিকদের পরবর্তী প্রজন্ম সংখ্যা এবং ভাষাভিত্তিক ভাষিক জনগোষ্ঠীর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক পরিসংখ্যানও নেই। তাই ধারণা পাওয়ার জন্য 'উপাধিভিত্তিক' ভাষার নমুনা দেওয়া হলো–

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
০১.	গোয়ালা	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি/ হিন্দি
০২.	যাদব	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	"	"

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
০৩.	আহির	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	”	”
০৪.	চৌহান	লবণ তৈরি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
০৫.	নুনিয়া	লবণ তৈরি	”	ভোজপুরি
০৬.	পান তাঁতি	বস্ত্রবয়ন	উড়িষ্যা	উড়িয়া
০৭.	তাঁতি	বস্ত্রবয়ন	উড়িষ্যা	উড়িয়া
০৮.	সিং ভূমিজ	কৃষিকাজ	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা, হিন্দি
০৯.	ভূমিজ	কৃষিকাজ	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা, হিন্দি
১০.	রুহিদাস	চামড়ার কাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১১.	রবিদাস	চামড়ার কাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১২.	দেশওয়ারা	ডোমজাতীয়	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৩.	করি	ডোমজাতীয়	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৪.	শতনামী	চামড়ার কাজ	বিহার	হিন্দি
১৫.	গড়	বিবাহাদি অনুষ্ঠানে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৬.	রাজগড়	”	”	”
১৭.	গুড়	”	”	”
১৮.	বাউরি	সূতার কাজ	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৯.	শঙ্কর বাউরি	”	”	”
২০.	মুন্ডা	শিকার	বিহার	সাদরি হিন্দি, বাংলা মানভূম, মুন্ডারি
২১.	কৌম্পাউন্ড মুন্ডা	পশুপালন	পশ্চিমবঙ্গ	”
২২.	মালকি মুন্ডা	”	”	”

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
২৩.	পাথর মুন্ডা	”	”	”
২৪.	মুড়া	”	”	”
২৫.	কন্দ	বাঁশ/বেতের কাজ	উড়িষ্যা	উড়িয়া
২৬.	হাজারা	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	ভোজপুরি
২৭.	কৈরি	কৃষি/শাকসবজি বিক্রি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
২৮.	শিং	কৃষিকাজ	”	”
২৯.	পান্ডে	পুরোহিত	উত্তর প্রদেশ	”
৩০.	চৌবে	পৌরহিত্য	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
৩১.	ত্রিপাঠী	”	”	”
৩২.	চতুর্বেদী	”	”	”
৩৩.	মিশ্র	পৌরহিত্য	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
৩৪.	বর্মা	স্বর্ণকার	”	”
৩৫.	সোনার	স্বর্ণকার	”	”
৩৬.	রাজভর	পশুপালন	”	”
৩৭.	টাটের	কাসার জিনিসপত্র তৈরি	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি [সংমিশ্রিত]
৩৮.	কানু	রকমারি খাবার তৈরি	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি ”
৩৯.	কংকর	বিবাহাদিতে খাবার পরিবেশন	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি ”
৪০.	পানিকা	পানি দেওয়া	বিহার	মিশ্র হিন্দি
৪১.	কাহার	পালকি বহন	বিহার, উড়িষ্যা	হিন্দি, উড়িয়া
৪২.	চাষা	দা, কাঁচি তৈরি করা	পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা [মানভূম]
৪৩.	পাশি	কৃষিকাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
৪৪.	লোহার	লোহার কাজ	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৪৫.	কালোয়ার	ব্যবসা	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ দেশওয়ালি
৪৬.	সাঁওতাল/সন্তাল	শিকার, পশুপালন	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	সাঁওতালি
৪৭.	নায়েক	বাদক (বাদ্যকর)	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	সাদরি
৪৮.	প্রধান	বিচার কাজ	উড়িষ্যা, বিহার	উড়িয়া, হিন্দি [মিশ্র]
৪৯.	শর্মা	পৌরহিত্য	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
৫০.	নাইডু		মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	তামিল
৫১.	খয়রা	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৫২.	মান্না	চুলকাটা	বিহার	ভোজপুরি
৫৩.	প্রজাপতি	পুতুল তৈরি করা	উত্তর প্রদেশ	”
৫৪.	প্যাটেল	ব্যবসা	গুজরাট	-
৫৫.	চৌরাশিয়া	পাহারাদার	নেপাল	নেপালি
৫৬.	ভুইয়া	পশুপালন, কৃষি	বিহার	ভোজপুরি
৫৭.	বিন	কৃষি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
৫৮.	ঘাসি	বাদ্যকর, কারুকাজ	বিহার	সাদরি
৫৯.	বাগতি	এালি	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৬০.	রাউতিয়া	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার	সাদরি
৬১.	সিং রাউতিয়া	কৃষি	”	”
৬২.	মাল	বাদ্যকর	উত্তর প্রদেশ, বিহার	সাদরি [অন্য ভাষাও চলে]
৬৩.	রাজবংশী	-	বিহার	-
৬৪.	বেনবংশী	বাজনা	বিহার	ভোজপুরি
৬৫.	শুক্লবৈদ্য	ধোপা	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূমি বাংলা

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৬৬.	রজক	ধোপা	”	”
৬৭.	বুনারজি	কৃষি	উড়িষ্যা	উড়িয়া/মানভূম বাংলা
৬৮.	মাহারা	এালি	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৬৯.	উরাং	শিকার	বিহার	সাদরি
৭০.	দুধবংশী	-	বিহার	”
৭১.	হাজাম	ক্ষৌরকর্ম	বিহার, উত্তরপ্রদেশ	ভোজপুরি
৭২.	ঘাটোয়ার/ ঘাটোয়াল	-	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৭৩.	শীল	ক্ষৌরকর্ম	পশ্চিমবঙ্গ	”
৭৪.	কৈবর্ত	মাছের ব্যবসা	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৭৫.	থাপা	-	নেপাল	নেপালি
৭৬.	বাহাদুর	-	”	”
৭৭.	কৈরালা	-	নেপাল	নেপালি
৭৮.	পট্টনায়েক		উড়িষ্যা	উড়িয়া
৭৯.	ভোক্ত/ ভক্তা		পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৮০.	মঞ্জু/গঞ্জু		পশ্চিমবঙ্গ	” ”
৮১.	খেড়োয়ার		পশ্চিমবঙ্গ	” ”
৮২.	খাড়িয়া	শিকার	মধ্যপ্রদেশ	খাড়িয়া ভাষা
৮৩.	মাড়িয়া	শিকার	বিহার	এক অংশ খাড়িয়া, উড়িয়া
৮৪.	ভর	চর্মকার	বিহার	সাদরি
৮৫.	দোসাদ		উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি
৮৬.	তেওয়ারী	পৌরহিত্য	অন্ধপ্রদেশ	”
৮৭.	অলমিক		অন্ধ্রপ্রদেশ	তামিল/তেলেগু

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৮৮.	মাহাতো কুর্মি [সাদ্রি কুর্মি]	কৃষি	অন্ধ্রপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
৮৯.	রেলি	-	বিহার	দেশওয়ালি
৯০.	রিকিয়াসন	-	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৯১.	তংলা	-	উড়িষ্যা, গারো পাহাড়	গারো/উড়িয়া [সামান্য]
৯২.	ছত্রী	-	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
৯৩.	রাজভর	-	বিহার	উড়িয়া, মানভূম বাংলা
৯৪.	পায়েক	-	উড়িষ্যা	দেশওয়ালী
৯৫.	মাহালী	-	পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা	সাদ্রি, মানভূম বাংলা
৯৬.	গাড়েড়ি	পশুপালন	উত্তরপ্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
৯৭.	ক্ষত্রি		উড়িষ্যা	উড়িয়া
৯৮.	মহান্তি		উড়িষ্যা	”
৯৯.	বাড়ৈ		বিহার	দেশওয়ালি
১০০.	মৃধা		বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা, অন্যান্য
১০১.	শবর	শিকার	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	” ”
১০২.	বাড়াইক/বড়াইক/চিড় বড়াইক/ভূমিজ	কাপড় ব্যবসা	বিহার	মানভূম বাংলা
১০৩.	সিং বাড়াইক	”	বিহার	”
১০৪.	মালহা	নৌকা চালানো	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১০৫.	চিনিম	-	গাড়ো পাহাড়	গারো
১০৬.	তুরি	ঢোলবাজনা	ছোটনাগপুর	মানভূম বাংলা
১০৭.	কুভার	-	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১০৮.	মোদি, মুদি	কৃষি	বিহার	খাড়িয়া

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
১০৯.	হাড়ি	কৃষি, পরিচ্ছন্নতা করা	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১১০.	খদাল	-	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১১১.	সোরি	-	উড়িষ্যা	সৌরী
১১২.	তেলেঙ্গা	-	মধ্যপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
১১৩.	তুলিয়া	বাঁশ ও বেতের কাজ	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১১৪.	পাথরমুড়া/ মুণ্ডা/পাত্র	পাহাড়ি কৃষি	বিহার, সাওতাল পরগণা, ছত্রিশ গড়	সাদ্রি
১১৫.	তেলি	তেল তৈরি	বিহার	দেশওয়ালি (বর্তমানে পাল টাইটেল লেখে)
১১৬.	দুবে	পৌরহিত্য	উত্তর প্রদেশ	ভোজপুরি
১১৭.	কুর্মি	কৃষি	উত্তর প্রদেশ	ভোজপুরি
১১৮.	গৌণ্ড/ গৌড়/গন্ধ/রাজগন্ধ	কৃষি/ শিকার	মধ্যপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ মানভূম বাংলা
১১৯.	মাঝি/ দেও মাঝি	কৃষি	সাওতাল পরগণা, উড়িষ্যা, বিহার	সাদ্রি/সাওতাল, মানভূম বাংলা
১২০.	দেশোয়ারা	চর্ম দিয়ে বাদ্যযন্ত্র	উত্তর প্রদেশ	দেশওয়ালি
১২১.	পালি	-		
১২২.	রাজপুত	-	দক্ষিণ ভারত	-
১২৩.	মহেশ্বরী	-	-	-
১২৪.	ভগৎ	-	মধ্যপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
১২৫.	রিকমুণি/রিমণ	-	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১২৬.	কালিন্দি	-	উড়িষ্যা, বিহার	মানভূম বাংলা, উড়িয়া
১২৭.	পানুয়া	-	-	-
১২৮.	গোস্বামী	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১২৯.	বাগতি/বাস্তি/বাগদি	কৃষি, চর্মপেশা	পুরুলিয়া	মানভূম বাংলা

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
১৩০.	রাও	-	-	-
১৩১.	জেসুয়ারা/ দেশোয়ারা	-	উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ ভোজপুরি
১৩২.	তন্তুবায়	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৩৩.	বৈদ্য	ধোবা	”	মানভূম বাংলা
১৩৪.	কোয়েরা	-	-	-
১৩৫.	পাত	-	-	-
১৩৭.	মাদ্রাজি	-	মাদ্রাজ	তেলেগু
১৩৮.	সাধু	-	পুরুলিয়া	মানভূম বাংলা
১৩৯.	পান	-	উড়িয়া	উড়িয়া
১৪০.	পরধান	-	উত্তরপ্রদেশ	ভোজপুরি
১৪১.	নাগেসিয়া	বাজনা বাজানো	মধ্য প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
১৪২.	ঝরা	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায়	মানভূম বাংলা, সংমিশ্রণ
১৪৩.	শীল	ক্ষৌরকর্ম	উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ ভোজপুরি
১৪৪.	তাহা/চাষা/তশা	কৃষি	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১৪৫.	চাষা (বাংলার)	”	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৪৬.	ত্রিপুরি	কৃষি জুম	ত্রিপুরার পাহাড়	ককবরক/ত্রিপুরি
১৪৭.	পাইনকা	-	ছত্রিশগত	পাইনকা, মানভূম
১৪৮.	বাঙালি	কৃষি	বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা	১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালিরা (তার মধ্যে মুসলিম সংখ্যা অধিক) চা বাগানে কাজ করতে দেখা গেছে। পঞ্চগড়-দিনাজপুর

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
				এলাকার নবগঠিত চা বাগানে বাঙালি শ্রমিকদের সংখ্যা কম নয়।

(তালিকাটি মৌলভীবাজার জেলার পুরাতন চা বাগানের বয়স্ক পুরুষ, সর্দার, পঞ্চায়েত, স্ব-স্ব সমাজপতি ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি করা হয়েছে। এর বাইরে আরো কিছু পদবিধারীদের ভাষা রয়েছে)

চা শ্রমিকদের শিকড়ের ভাষা যখন সংমিশ্রিত উচ্চাণের পথ ধরে

এক একটি চা-বাগানে রয়েছে হরেক রকম ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস। অনেক বাগানে মুসলমান রয়েছেন। কিন্তু কোথাও সংঘাত নেই। নানা ধর্ম, উপধর্ম, প্রকৃতি পূজারি, সর্বপ্রাণবাদী, বিভিন্ন লোকায়ত দর্শনের, সমাজের, জাতির (নানা গোষ্ঠী ও উপশাখা), আদিবাসী/নৃ-গোষ্ঠীর (উপশাখা) বহুসংখ্যক লোকজন রয়েছে যে, তাদের ভাষা বিচার করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলোতে অনুমানিক ১৮৬০–১৯৩০ সালে ভারতের নানা স্থান থেকে শ্রমিকরা আসতে থাকে। যে শ্রমিকরা একদিন সিলেট-আসামের জঙ্গলে এসেছিল– অতঃপর 'আইনী প্যাচ', 'গিরমিট' (চুক্তি) প্রথা, অর্থের অভাব, বাড়ির পথ ভুলে যাওয়া, রাস্তা বদলে যাওয়া, ঠিকানা না থাকা, আড়কাটির পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে; সেই শ্রমিকদের কোনো অংশ-ই কখনো মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেনি। অর্থাৎ পাহাড়ি-ব্যূহের মধ্যে থিতু হওয়া চা শ্রমিকদের এখন প্রায় পঞ্চম প্রজন্ম অতিক্রম করছে (আগমন ১৮৬০ সাল থেকে হিসেবে করে প্রতি ৩০ বছরে এক প্রজন্ম-কাল ধরা হয়েছে। তবে চা বাগানে ২০/২৫ বছরে এক প্রজন্ম ধরা-ই সংগত)। সুদীর্ঘকাল থেকে চা শ্রমিকরা নিজের জন্মস্থান/শিকড়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়– আদি শব্দ/ভাষা/বর্ণের আদিরূপ/কথ্যরূপ থেকে তারা বহু দূরে সরে গিয়ে সংমিশ্রিত-ঢং মিশিয়ে কথার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

যে কিছু ভাষার হরফ ছিল– সেগুলোর লেখ্যরূপও অনেকে জানেন না। কারণ চর্চার দীর্ঘকালের স্থবিরতা, অশিক্ষা ও হরফ-অনভিজ্ঞ ও জোগানের অভাবে অনেক ভাষিক জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা-সংস্কৃতির নিজস্বতা হারিয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নানাকারণে– বিশেষত চা বাগানের আইনে বহিষ্কৃত পুরাতন শ্রমিক এবং যারা স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়েছিল; কিংবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল– তারা পিতৃপুরুষের জন্মভিটায় ফিরতে না পেরে বাগানের পাশেই সরকারি জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। এই জনগোষ্ঠী বাঙালি সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে 'ভাঙা-ভাঙা বাংলা' আয়ত্ত করে। বিশেষত সিলেট ও শ্রীমঙ্গল শহরের পাশে এরূপ কিছু 'এক্স লেবারদের কলোনি' দৃষ্টিগোচর হয় (আগে শহর বর্তমানের মতো সম্প্রসারিত ছিল না)।

চা জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংকট

দেশ-ভাগের আগে সুরমাভ্যালি এবং ব্রহ্মপুত্রভ্যালি, আসামভ্যালির চা শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত (অধিকাংশ বিবাহসূত্রে) কিছুটা যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ ছিল। বিভিন্ন কায়দায়/ছলনায় তাদের আশপাশের বিভিন্ন

বাগানে যেতে পারতো– অর্থাৎ স্থানান্তরিত হতো। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ভিসা আইন চালু হওয়ার পর সে সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের শ্রমিকরা আর ওপারে যেতে পারনি (ভারতে)। ঔপনিবেশিক আইনের জাঁতাকলে চা শ্রমিকরা সেকালে শিক্ষার মধু পান করতে পারেনি। অশিক্ষার অভাবে চা শ্রমিকদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় ছিটেফোঁটাও সাহিত্য রচনা করতে পারেনি। মোদ্দাকথা, গহিন নির্জনে থাকা চা-বস্তিগুলোর সাথে স্থানীয় বাঙালি সমাজের (আইনগত কারণে) কার্যত যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাগানিরা তাদের বাগানের পাশের বাজারে (যাকে 'লেনের বাজার'/ 'গন্তিরবাজার'/ 'তলব বারের বাজার' বলা হতো) আসতো। ফলে ব্রিটিশ আমল গড়িয়ে পাকিস্তানের মধ্য সময় পর্যন্ত চা শ্রমিকদের ওপর স্থানীয় বাংলা ভাষার প্রভাব কম পড়েছে। বিশেষত সত্তরের নির্বাচনের সময় থেকে চা বাগানগুলোতে বাঙালিরা অবাদে প্রবেশের সুযোগ পায়। ফলে চা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় বাঙালির সাথে দৈনন্দিন লেনদেন, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, লেখাপড়ার সংযোগে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে তাদের মনোজগতে ঠাঁই দিচ্ছেন নিজস্ব কায়দায়। ওদিকে আবার তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে চা জনগোষ্ঠীর অনেক ভাষা অতি বিপন্ন ভাষায় ঠাঁই নিচ্ছে। সবচেয়ে মহাবিপন্ন অবস্থায় রয়েছে– 'সোরা/সৌরা ভাষা' (একসময়ের অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা, যারা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও বিহার থেকে এসেছিলেন– তাদের একাংশ সৌরী ভাষায় কথা বলতেন)। কারো মতে মুণ্ডারা সৌরী ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার বর্ণমালা আছে।

বর্তমানে খাড়িয়া মহাবিপন্ন একটি ভাষা। খাড়িয়া সমাজের লোকেরা এই ভাষায় কথা বলে। যাদের আদি নিবাস হলো ছোটনাগপুর, রোহতাসগড়, অযোধ্যার পাহাড়ি অঞ্চল। সাংবাদিক আফরোজ আহমদ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মূল 'খাড়িয়া ভাষা'য় কথা বলার মতো এখন বাংলাদেশে মাত্র দুই বোন জীবিত রয়েছেন (তারা শ্রীমঙ্গল বর্মাছড়া চা বাগানে থাকেন; আদিনিবাস ভারতের ঝাড়খণ্ড, বাংলাদেশে লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০০ জন। নিজস্ব বর্ণমালা নেই; তবে মিশনারিরা রোমান হরফে লেখার পথ করে দিয়েছে)। বাংলাদেশের খাড়িয়ারা এখন বাংলায় কথা বলছে।

অন্যদিকে উরাং/ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম 'কুরুখ ভাষা'– যা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাও এখন বিপন্ন হতে চলেছে। 'কুরুখ ভাষা'র লিপি 'তুলং সিকি' থাকলেও বাংলাদেশে এ লিপির ব্যবহার নাই। অনুসারী উরাংদের নবপ্রজন্ম সংমিশ্রিত বাংলায় কথা বলে। এই ভাষার ওপর কাজ করেছেন গবেষক দীপংকর শীল। তিনি মনে করেন, শিশুদের কুরুখ বর্ণমালা শেখানো দরকার। তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। আমাদের দৃষ্টিতে একুশ শতকে এসে চা বাগানে সবচেয়ে বিপন্নভাষা হলো– **১. খাড়িয়া ভাষা; ২. সৌরী ভাষা; ৩. ছত্তিসগড়ী (পাইনকা সমাজের ভাষা); ৫. মুণ্ডারি; ৬. কুরুখ ভাষা**। অন্যান্য ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিশেষত প্রতিটি চা বাগানে একটি করে প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপনের নীতিমালার আলোকে গড়ে তোলা প্রাইমারির বইগুলো বাংলা ভাষায় পড়তে হয়। আশার কথা যে, বর্তমান সরকার মৌলভীবাজার জেলার চা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি চা বাগনে বিপন্ন কুরুখ ভাষার অবস্থা (ক্ষেত্র গবেষণা করে পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন গবেষক দীপংকর শীল) নিম্নে দেওয়া হলো–

সারণি-১

জনতাত্ত্বিক বণ্টন ও ভাষিক পরিস্থিতি [কুরুখ ভাষা]

মির্তিঙ্গা চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	হালকিটিলা	৫৪	২৬৮	কুরুখ
২.	পাথরটিলা	৪৭	২০৭	কুরুখ
৩.	বড়লাইন	২২	১০৯	সাদরি + কুরুখ (মিশ্রভাষা)
৪.	সরইবাড়ি	৪১	১৬১	কুরুখ
৫.	করাতি টিলা	৫	৩৪	কুরুখ
৬.	ফাঁড়ি	১১৯	৬০৯	কুরুখ
৭.	পশ্চিম কালাছড়া	২৯	১৪২	কুরুখ
৮.	চাউতলি	২	৯	কুরুখ+মিশ্র
৯.	৯ নম্বর কালাছড়া	২৫	১৩২	কুরুখ + সাদরি
১০.	২২ নম্বর	১৮	৮১	কুরুখ
১১.	বোমবোতল	৩	১৮	সাদরি+মিশ্র
১২.	আমড়াকোণা	৩	২৫	কুরুখ+সাদরি
	মোট	৩৬৮	১৭৯৫	১৩ শতাংশ মিশ্রভাষা

সারণি-১ মির্তিঙ্গা চা বাগানে মোট উরাং পরিবার সংখ্যা ৩৬৮টি, মোট লোকসংখ্যা ১,৭৯৫ জন। প্রায় ৯২ শতাংশ লোক কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। বাকি ৮ শতাংশ লোকের ভাষায় সাদরি ও কুরুখের মিশ্রণ ঘটেছে।

সারণি- ২

ভাষিক পরিস্থিতি [কুরুখ]

দেওড়াছড়া চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	বামনবিল	৮০	৩৭০	৭০টি পরিবার কুরুখ এবং ১০টি পরিবার মিশ্র ভাষায় কথা বলে।
২.	ঘুংগিবিল	৫৪	২৭৩	৪০টি পরিবার কুরুখ এবং ১৪টি পরিবার সাদরি ভাষায় কথা বলে।
৩.	৬ নম্বর	৫২	২৩৩	কুরুখ
৪.	৭ নং	২৪	১১২	কুরুখ
৫.	১০ নম্বর	৪	২৪	কুরুখ
৬.	১৩ নম্বর	২	১০	কুরুখ

৭.	রাঁচিটিলা	৯	৩৫	সাদরি
৮.	বাজারটিলা	৫	১৭	সাদরি
৯.	আলীনগর টিলা	১	৬	সাদরি
	মোট	২৩১	১০৮০	

সারণি-২: দেওড়াছড়া চা বাগানে ২৩১টি পরিবারে মোট জনসংখ্যা ১০৮০ জন। এরমধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ পরিবারের লোক কুরুখ, সাদরি ও বাগানি বাংলা তথা মিশ্রভাষায় কথা বলেন।

সারণি-৩

ভাষিক পরিস্থিতি (কুরুখ)

আলীনগর চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	আলীনগর	৮	৩৯	মিশ্রভাষা
২.	সুনছড়া	১৭	১০০	মিশ্রভাষা
৩.	কামারছড়া	২০	১১১	সাদরি (কুরুখ ১ জন)
	মোট	৪৫	২৫০	

সারণি-৩: মোট ৪৫টি পরিবার এবং জনসংখ্যা ২৫০ জন। এখানে কুরুখ ভাষার ব্যবহার নেই। বৈবাহিক সূত্রে কুরুখভাষী ১ জন মহিলা আছেন। কুরুখ ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না।

সারণি-৪

ভাষিক পরিস্থিতি (কুরুখ)

বাগিছড়া চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	বাগিছড়া চা বাগান	২	১৩	মিশ্র

সারণি-৪: বাগিছড়া চা বাগানে ২টি পরিবার আছে এবং এখানে লোকসংখ্যা ১৩ জন। এদের ভাষা মিশ্র। কুরুখ ভাষার ব্যবহার নেই।

চারটি চা বাগানের পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরুখ ভাষা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে এবং মিশ্ররূপ ধারণ করছে। বিপন্ন কুরুখ ভাষা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে গবেষক দীপংকর শীল কুরুখ বর্ণমালা দিয়ে সমাজের শিশুদের শেখানোর চেষ্টা করছেন।

চা বাগানে বাংলা ভাষার প্রভাব

ভাষা গবেষক ড. শ্যামলকান্তি দত্ত ও দীপংকর শীল মনে করেন যে, চা শ্রমিকরা বাস্তবতার কারণে দ্রুত তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে বাংলাভাষার দিকে ঝুঁকছে। ঘরে-বাইরে সংমিশ্রিত বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করছে। ফলে তাদের উচ্চারণ যথার্থ বাংলা উচ্চারণ না হয়ে ভিন্নমাত্রায় উচ্চারিত হচ্ছে– যা চা বাগানে 'বাংলী' নামে নতুন 'ভাষা-শব্দ' জন্ম নিয়েছে। ড. মো আশ্রাফুল করিমও বর্তমানে চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকার লক্ষ করেছেন যে, সিলেট অঞ্চলের হাট-বাজার ও গ্রামাঞ্চলের কাছে যে-সকল চা বাগানের অবস্থান রয়েছে– সে বাগানের শ্রমিকরা 'বাংলী'র সাথে সিলেটী শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণ করার প্রবণতা রয়েছে।

চা বাগানে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে বাংলা ভাষার একটি বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয়েছে যাকে 'বাগানি বাংলা' হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর বাচনিক বৈশিষ্ট্য, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, শব্দ ও বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত, নিজ নিজ মাতৃভাষা থেকে ধার করা শব্দের সাবলীল প্রয়োগ 'বাগানি বাংলা'কে ভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলা ভাষায় না-বাচক ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু চা জনগোষ্ঠীর মুখে না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণটি সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: 'তোর বৌদিরা তো এমন সোয়াদ তরকারি **নাই বানাইতে পারে** রে!' অথবা, 'আজ বাজারে **নাই যাব**।' খবর **নেই পাঁলো** (খবর পাইনি)। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষাভাষী তার মাতৃভাষার অনুকরণে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সাদরি যাদের মাতৃভাষা তারা বাংলা কথাবার্তায় অনায়াসেই সাদরি রূপ ব্যবহার করে। যেমন: বিশেষ্য পদের ব্যবহার: ভাটু (ভগ্নীপতি), লেড়কা (ছেলে), আংলি (আঙ্গুল), আঁইখ (চোখ) ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের ব্যবহার: সাফা (পরিষ্কার), বেজান (অনেক), বাগানিয়া আদমি (বাগানি লোক), আচ্চা আদমি (ভালো লোক), একঠো, দুইঠো, তিনঠো ইত্যাদি।
বিশেষণের দ্বিত্বপ্রয়োগ: ছোটে ছোটে ঘর, বহুত বহুত আদমি।
সম্বন্ধ পদের ব্যবহার: উকের ভাই (তার ভাই), মাটিকের ঘইলা (মাটির কলস)।
অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার: দেইখকে (দেখে), যায়কে (যেয়ে), খাবে হলে (খেয়ে), কাটেকলে (কেঁটে), রহেকলে (থেকে) ইত্যাদি।

কুরুখ যাদের মাতৃভাষা, তাদের মুখের ব্যবহৃত বাংলার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হলো। বাংলা রূপমূলের সাথে কুরুখ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এক ধরনের মিশ্র শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, যেতনা-তেতনা (যখন-তখন), বাড়য়ালি (বাড়ে), একাবারি (একেবারে), মেশাবানার (মিশিয়ে দিত), বাহরি (বাইরে), ভিতরি (ভিতরে), স্বাপেনা (স্বপন)।

বাগানি বাংলায় কতিপয় ধ্বনি পরিবর্তনের নমুনা: গিয়েলিল (গিয়েছিল), দাউ (দা), কাঁটাই দিলাম (কেঁটে দিলাম), আই গেল (এসে গেল), হিয়ানে (এখানে), উঠাই গেল (উঠে গেল), ছাতি তাইক করে মার (ছাতি তাক করে মার), হামি (আমি), বান্দরা (বান্দর), গাধহা (গাধা), লিল (নীল), লাটখানা (লটকা), কওন (কোন), কতি সময় (কত সময়), কিনো (কেন), কেহু (কেউ), ছট (ছোটো) ইত্যাদি।

প্রত্যেক চা বাগানে সমানহারে ভাষিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে না; ভাষিক সম্প্রদায়ে অনেক তারতম্য থাকে। চা বাগানের বৈচিত্র্যময় ভাষাকে বাঁচাতে হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়,

ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, চা বোর্ড, বাগান কর্তৃপক্ষ এবং সম্প্রদায়গত সমাজপতি নিয়ে সকলের মাতৃভাষা রক্ষার্থে প্রথমেই সকল ভাষিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার ওপর বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা চালাতে হবে। পাশাপাশি চা-জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথক মাতৃভাষায় পাঠ্যবই তৈরি করা যেমন অবশ্যক; তেমনি প্রতিটি বাগানের বস্তিতে/পাড়ায় স্যাটেলাইট ভাষা স্কুল প্রচলন করা জরুরি। তাছাড়া চা-জনগোষ্ঠীর ভাষা গবেষণার পথ উন্মুক্ত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, আফরোজ (৪ঠা এপ্রিল, ২০২৪)। 'সংকটে চা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি'। *বণিকবার্তা*।

করিম, মো. আশ্রাফুল। 'সিলেটের চা শ্রমিকদের ভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ'। *The Dhaka University Journal of Linguistics;* vol-2 No-4. August 2010.

কাসেম, আবুল (২০১০)। *চা শিল্পের ইতিহাস*। ঢাকা: গতিধারা।

গাইন, ফিলিফ (২০২২)। *চা শ্রমিকের কথা* (সম্পাদিত)। ঢাকা: সেড।

দেশোয়ারা, মিন্টু (একুশ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)। 'হারিয়ে যাচ্ছে সৌরা ভাষা'। *ডেইলি স্টার*।

ফুকন, উমানন্দ (১৯৮৪)। *দি এক্স টি গার্ডেন লোবার পপুলেশনইন আসাম*। নিউদিল্লি।

মোহান্ত, রসময় (২০০৮)। *বাংলাদেশের চা শিল্প ও শ্রম*। শ্রীমঙ্গল: মুদ্রণবিদ কম্পিউটার।

শীল, দীপংকর (২০২২)। *উরাং জনগোষ্ঠীর কুরুখ ভাষা পরিচয় ও অভিধান*। কমলগঞ্জ: শিল্পকলা একাডেমি।

সনজয়, পার্থ। (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'চা শ্রমিকদের সৌরা ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে'। *একাত্তর টিভি*।

সামা, ভার্জনিয়াস (১৯৯৬)। 'কন্ডিসন অব টি এস্টেট লেবারার্স ইন আসাম' শীর্ষক প্রবন্ধ। সরিৎ কে ভৌমিক সম্পাদিত (যৌথ) *টি প্লেন্টেটশন লেবার ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থ। নিউ দিল্লি।

Hossain, Ashfaque (2023). *Colonial Globalization and its Effect on South Asia*. London/New York: Routledge.

কৃতজ্ঞতা

চিত্তরঞ্জন রাজবংশি, প্রভাষক, গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজ, গোয়াইনঘাট, সিলেট।

দীপংকর শীল, প্রভাষক, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়।

রাজেন্দ্র বুনারজি, চা শ্রমিক নেতা, কালিঘাট রোড়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

ড. শ্যামলকান্তি দত্ত, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কলেজ, চট্টগ্রাম।